দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR 21 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পাঁচ বছরে ৮ কোটি টাকা লুটপাট

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

সরকারী ব্রজমোহন কলেজে গত পাঁচ বছরে অন্তত ৮ 'কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। এ টাকা লুটপাটের সঙ্গে জড়িত কলেজের অধ্যক্ষ, একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মচারী। কলেজের উন্নয়নের নামে, ঠিকাদারীর নামে ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে আদায় করে এই অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে। দুর্নীতিপরায়ণ এই শিক্ষক ও কর্মচারীদের কাছে কলেজটি হয়ে উঠেছে 'সোনার ডিমপাড়া হাঁস'। এঁদের অনেকেই এই কলেজে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির সুবাদে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেছেন। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

ব্রজমোহন কলেজের সুনাম ছিল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি এ কলেজে শিক্ষকতা করেছেন, ছাত্র ছিলেন। একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ ও সুযোগ সন্ধানী শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য কলেজটির চরিত্র বিতর্কিত হয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ শিক্ষক ১৫ বছর ২০ বছর ধরে চাকরি করছেন। সরকারী চাকরিবিধি এঁদের কাছে খোলামকুচি। কেউ যদি কখনও দৈবাৎ বদলি হন, তবে পার্শ্ববর্তী কোন সরকারী কলেজে। সেখানে কিছুদিন থেকে ফের এই কলেজে তদ্বির করে চলে আসেন। অনেক শিক্ষক আছেন- এখানেই চাকরিতে ঢুকেছেন এবং এখনও আছেন। প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে যেসব শিক্ষকের তাঁদের বেশির ভাগই চরম দুর্নীতিবাজ। তাদের আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি নেই। ব্রজমোহন কলেজকে কার্যত এসব শিক্ষক তাঁদের আখের গোছানোর যন্ত্রে পরিণত করেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজ অধ্যক্ষ বিভিন্ন খাতে ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারীকে নিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। তিনি উপাধ্যক্ষ থাকার সময় থেকেই কলেজকে দুর্নীতির সাগরে ডুবিয়ে দেন। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে তিনি বেসরকারী ফান্ডে বিভিন্ন খাতে ফিসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। বিএনসিসিতে ইতোপূর্বে ১২ টাকা নেয়া হলেও তিনি বাড়িয়ে ১৫ টাকা করেন। পরিবহন খাতে ৫০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা, গ্রন্থাগার জামানত ১০ টাকার স্থলে ২৫ টাকা, কলেজ পরীক্ষা ফিস ৫০ টাকার স্থলে ৮০ টাকা, ভর্তিপরবর্তী কার্যক্রম খাতে ২৫ টাকার স্থলে ৩০ টাকা, পরিচয়পত্রে ১০ টাকার স্থলে ২০ টাকা, বিবিধ খাতে ২০ টাকার স্থলে ৩৫ টাকা, ছাত্র সংসদ খাতে ১৫ টাকার স্থলে ২০ টাকা, কমনরুমের নামে ১২ টাকার স্থলে ১৫ টাকা, গবেষণাগার জামানত ৪০ টাকার স্থলে ৫০ টাকা আদায় করা হয়। গ্রন্থাগার জামানত ও গবেষণাগার জামানতের নামে টাকা আদায় করা হলেও কখনও তা ফেরত দেয়া হয় না। কলেজ রক্ষণাবেক্ষণের নামে নতুন খাত তৈরি করে অর্থ আদায় করা হয়। যেসব খাত উল্লেখ করা হয়েছে তার বেশির ভাগই ভুয়া। কলেজ রক্ষণাবেক্ষণ, কলেজ উন্নয়ন, রিলিফ, চিকিৎসা ভাতা, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ভর্তিপরবর্তী কার্যক্রম, বিবিধ, ম্যাগাজিন, ৪র্থ শ্রেণীর সাহায্য ইত্যাদি নাম দিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করে আত্মসাত করা হয়। প্রতিবছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না। অথচ প্রতি বছর এ খাতে অর্থ আদায় করে লুটপাট করা হয়। ঐ শিক্ষাবর্ষে ১ম পর্ব স্নাতকোত্তরে ভর্তি হতে বিজ্ঞান অনুষদে ১১৬০ টাকা নেয়া হয়। যার মধ্যে সরকারী ফিস ৩৯২ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ ৭৬৭ টাকা আদায় করে। এমনিভাবে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রপ্রতি ১১শ' টাকা আদায় করা হয়। যার সরকারী অর্থ ৩৯২ টাকা, কলেজ কর্তৃপক্ষের ৭০৭ টাকা। আদায়কৃত টাকা লুটপাট হলেও কোন অডিট নেই। বছরের পর বছর এভাবে অবৈধ অর্থ আদায় হয়েছে।

'৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে এমএ শেষ পর্বে ফরম ফিলাপের জন্য মানবিক/বাণিজ্য শাখার ছাত্রদের কাছ থেকে এক হাজার পাঁচ টাকা আদায় করা হয়। অথচ ঢাকা কলেজে ঐ সময়ে ফরম ফিলাপে নেয়া হয় ৮৯৫ টাকা। এখান থেকেও কয়েক লাখ টাকা আত্মসাত করা হয়। এই শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা অনার্স পরীক্ষা দেবার পরপরই কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র অর্থ আদায়ের কৌশল হিসাবে এদেরকে বোকা বানিয়ে টাকা আদায় করে। বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্সে ভর্তি হতে হবে। ভর্তি ফী নেয়া হয় ১০৬০ টাকা। পরবর্তীতে এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই মাস্টার্সে ভর্তি হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন ফী ৭৫ টাকা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন রেজিস্ট্রেশন ফিস নেই। কিন্তু ছাত্রদের এই রেজিস্ট্রেশন ফিস ফেরত দেয়া হয়নি। '৯৪-৯৫ সেশনের মাস্টার্সে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে অবৈধভাবে 'লেট ফী' আদায় করে ভর্তি করা হয়। অথচ ঐ সেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন লেট ফী নেয়নি বন্যার কারণে। কিন্তু বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বোকা বানিয়ে অর্থ আদায় করে। '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে ভর্তি হতে কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফরমের দাম ১০ টাকার স্থলে ৬০ টাকা করে নিয়েছে। সরকারী নির্দেশ রয়েছে কোন ক্রমেই ভর্তি ফরমের দাম ১০ টাকার উপরে নেয়া যাবে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে সিদ্ধান্ত না মেনে ৬০ টাকা করে ফিস আদায় করে। ফরম কেনার পর ২টি রসিদে লেখা থাকে ভর্তি ফরম ১০ টাকা ও ভর্তি নির্বাচনী পরীক্ষা ৫০ টাকা। এভাবে ঐ শিক্ষা বর্ষে প্রায় ১২ লাখ টাকা আত্মসাত করা হয়।

প্রতিবছর পরীক্ষার সময় (ইয়ার ফাইনাল ও টেস্ট) ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন দফায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। যে টাকা কলেজ অধ্যক্ষ ও কর্মচারীরা ভাগ করে নেন। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে পরীক্ষার জন্য আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটে। ট্রান্সমিশন ও ব্যবস্থাপনা ফী বাবদ পরীক্ষার্থী প্রতি ৮৫ টাকা আদায় করা হয়। ১১ লাখ টাকা লুটপাট করেন অধ্যক্ষ ও কর্মচারীরা। এ টাকার ভাগ অন্য শিক্ষকরা পান না। এ নিয়ে শিক্ষক পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষের নানা কেলেঙ্কারি ঘটে।

কলেজের অধিকাংশ নির্মাণ কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ (যা কর্তৃপক্ষ করে) কোন টেন্ডার ছাড়াই করা হয়, যা কলেজ শিক্ষকরাই নামে বেনামে করেন। সম্প্রতি বিপুল অঙ্কের টাকার ফার্নিচার নির্মাণের ঠিকাদারী নিয়েছেন বেনামে বাংলা বিভাগের এক শিক্ষক। এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিএম কলেজের একটি সম্পত্তি দখলদারদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের বহু শ্রুত অভিযোগ রয়েছে। ইতিহাসের এক শিক্ষক বেনামে ছাত্রাবাসগুলোর অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেন। অভিযোগ রয়েছে, ইতোপূর্বে ২৭ লাখ টাকার ফার্নিচার নির্মাণেও ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নেয়া হয়। এতে কলেজের কয়েক শিক্ষকের পকেট ভারি হয়েছে। অধ্যক্ষও এর সাথে জড়িত।